যুগান্তর

তারিখ 10 JUN 2016 পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

মহসীন হাবিব

কী শেখাচ্ছে টিক চিহ্নের শিক্ষা পদ্ধতি

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মাছরাঙা ২৯ মে একটি প্রতিবেদন প্রচার করেছে। প্রতিবেদক ১৩ জন জিপিএ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সাক্ষাৎকার নিয়ে ওই শিক্ষার্থীদের বিদ্যা-শিক্ষার দৌড় দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রতিবেদক একজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নাম কী? জিপিএ-৫ আমতা আমতা করে অবশেষে বলল, জানি না। প্রায় সবারই চোখে চশমা, শিক্ষার্থীসুলভ চেহারা-আদল। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত কার লেখা? পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া একজন উত্তর দিল, কাজী নজরুল ইসলাম। একজন জানাল, নেপালের রাজধানীর নাম নেপচুন! আরেকজন শিক্ষার্থীর কাছে অপারেশন সার্চলাইট কী সেটা জানতে চাইলে সে আনন্দদায়ক উত্তর দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতালে অপারেশনের সময় উপরে যে লাইট টানানো থাকে সেটা অপারেশন সার্চলাইট! উল্লেখ্য, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের একজনও বলতে পারেনি জিপিএ'র সম্প্রসারিত রূপ কী। অর্থাৎ জিপিএ অর্থ কী।

ইন্টারনেটের সামাজিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদনটি ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। ফেসবুকে অসংখ্য মন্তব্যের মধ্যে একজন লিখেছেন, 'মাটিরে, তুই ফাক হ! আমি আর ওপরে থাকব না!' মজার খোরাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যা-শিক্ষার মান নিয়ে বহু লোক ব্যথিত হয়েছেন, হতাশা প্রকাশ করেছেন। আমাদের জানা ছিল যে বাংলাদেশে জিপিএ পাচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী, কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন হয়নি। এ নিয়ে অনেক কথাও হয়ে থাকে। তাই বলে পরবর্তী প্রজন্মের অনেকে যে এমন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে উঠছে তা ছিল ধারণার বাইরে। উপরে উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর যদি জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হয় তাহলে জিপিএ চার, তিন পেয়ে পাস করা শিক্ষার্থীদের অবস্থা কী! ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

প্রতি বছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় হাসিমুখে জানাচ্ছেন, শতকরা নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ পাসের কথা। এই পাসের হার আমাদের কাছে অর্থনীতির হিসাবে মাথাপিছু আয়ের মতোই একটি হাস্যকর বিষয় বলে মনে হয়। প্রশ্ন হল, কোনো শিক্ষায় উত্তরণের সুবাদে, কী ধরনের পরীক্ষা দিয়ে তারা উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা অর্জন করছে যারা জানে না দেশের রাষ্ট্রপতি কে, জানে না জাতীয় সঙ্গীত কার লেখা! আমরা যারা একটু আগের প্রজন্মের তাদের কাঁধে বইয়ের স্তূপ ছিল না, আমাদের মায়েরা স্কুলের সামনে গিয়ে বসে থাকতেন না, সকাল থেকে ঘুমাতে যাওয়ার আগ অবধি পড়ার চাপ ছিল না। আমরা স্কুল থেকে ফিরে ডাংগুলি খেলেছি, বিকেলে ফুটবলের মাঠে গিয়েছি। সেইসঙ্গে পরীক্ষার হলে আমাদের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে হয়েছে। আমাদের সময়ে ফার্স্ট ডিভিশনে, এমনকি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করা কোনো শিক্ষার্থী দেশের রাষ্ট্রপতির নাম জানবে না, অথবা নেপালের রাজধানীর নাম বলবে নেপচুন তা ভাবাই যায়নি। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ঠিক আগে একজন ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে সবাইকে হিসাব কষে কথা বলতে হতো। ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া ছেলেকে সমাজের লোকেরা আলাদা চোখে দেখত। এমনকি ভুল করে পুলিশ কোনো ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়া ছেলেকে থানায় নিয়ে এলে তার রেজাল্ট জানার পর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হতো। এসব আমাদের শিক্ষামন্ত্রীসহ নীতিনির্ধারকরা ঢের বেশি জানেন।

বর্তমান শিক্ষার্থীদের ওপর দায় চাপানো উচিত হবে না। বেচারা শিক্ষার্থীরা পরিস্থিতির শিকার। তাহলে এ দায় কার? অনেক কথাই এ সম্পর্কে বলা উচিত যা হজম করা মুশকিল। তারপরও চেষ্টা করা যাক শালীনতা বজায় রেখে কিছু আলোচনা করার। প্রথমত, কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে বর্তমান গড়পড়তা শিক্ষকদের শিক্ষাদানের

ক্ষমতা পূর্বের শিক্ষকদের সমান? সবার না হোক, কোনো কোনো শিক্ষকের নিয়োগ যে অনিয়মের মাধ্যমে ঘটেনি তা কেউ নিশ্চয়তা দিতে পারবেন? আজ থেকে ৩০ থেকে ৪০ বছর আগেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ছিল। কিন্তু আর যাই হোক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ছিল বিরল। আমাদের কালে আমরা কখনও শিক্ষকদের গাড়ি-বাড়ির দুশ্চিন্তায় মশগুল থাকতে দেখিনি। পণ্ডিত মশাইর মতো বেতন-ভাতা নিয়ে আক্ষেপ ছিল বটে, তাই বলে কেউ স্কুল ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করতে যেতেন না। বাংলাদেশে এখন দাবি-দাওয়া আদায়ে শিক্ষকরা জোটবদ্ধ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন; কিন্তু শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান নিয়ে কোনো জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয় না। অন্যদিকে উপলব্ধি করলে বোঝা যায়, বাংলাদেশই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে শিক্ষকরা রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহেলিত। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা তৈরিতেও দেশ পরিচালনাকারীরা ব্যর্থ হয়েছেন। জানা যায়, আশপাশের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে কম। প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রাথমিক শিক্ষকরা ১৪-১৫ নম্বর গ্রেডে বেতন-ভাতা ভোগ করবেন তা মানা যায় না। সুতরাং বিদ্যা-শিক্ষায় অবনতির দোষ কাকে দেব তা বুঝে উঠতে পারছি না। বেশকিছু বছর ধরে নতুন এক উপদ্রব দেখছি যা আমাদের সময়ে ছিল না। এর নাম কোচিং সেন্টার। আমাদের সময়ের গৃহশিক্ষক আর আজকের কোচিং সেন্টার কিন্তু এক জিনিস নয়। চোখের সামনে দেখছি বেকারত্ব ঘোচাতে গিয়ে একটি কোচিং সেন্টার চালু করে দশ বছরের মধ্যে তা অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিচ্ছে যা কোটি কোটি টাকার ব্যাপার! মফস্বল শহরে কোচিং সেন্টার খুলতে না খুলতেই লাল রঙের টি-শার্ট গায়ে যুবক কোচিং সেন্টারের মালিক আড়াই লাখ টাকা দামের মোটরবাইকে চড়ে ভু-ভু শব্দ করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এরা কী শিক্ষা বিতরণ করেন, নাকি পকেট কাটার কাজে নিয়োজিত? এরা কী-ই বা শেখাবেন? সরকারের শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের কাছে জানতে চাই, লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষার এই দায়িত্ব এমন অপরীক্ষিত লোকদের কাছে যাচ্ছে কেন, কীভাবে? দেয়ালে দেয়ালে লেখা দেখি লিটন স্যার, জনি স্যার, মফিজ স্যার। এরা কারা?

শিক্ষার্থীদের দুর্ভাগ্যের আরেকটু গভীরে যাওয়া যাক। বাংলাদেশে এক নতুন প্রতিযোগিতার সমাজ গড়ে উঠেছে। অর্থের প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার প্রতিযোগিতা, মান-ইজ্জতের প্রতিযোগিতা। এর জাঁতাকলে পড়েছে সন্তানদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর। প্রায় প্রতিটি বাবা-মা এখন সন্তানের নম্বরের জন্য উদগ্র। পাশের বাড়ির অর্ণবের চেয়ে দু'নম্বর কম পেলে অনেক মা বিছানায় পড়ে কাঁদেন। নিজের চোখ ফুলিয়ে ফেলেন এবং সন্তানের ঘুম হারাম করে দেন। এর মধ্যে সন্তান মানুষ করার স্বপ্ন যতটা, তার চেয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং বিদ্বেষের লক্ষণই কি বেশি নয়? আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করি, ছেলে স্কুলে ভর্তি হতে না হতে অভিভাবকদের মধ্যে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন বিকট রূপ লাভ করেছে। বেশিরভাগ অভিভাবকের সন্তানকে একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নেই। বলা হয়ে থাকে, মা হচ্ছেন সন্তানের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ মায়েদের জীবনাচার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে বরং বলা ভালো, মায়ের হয়ে ওঠা প্রয়োজন প্রথম শিক্ষক।

বেশ কিছুকাল ধরেই প্রশ্ন উঠেছে, এই গ্রেডেশন পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কী উপকারে আসছে? একজন হুমায়ুন আজাদ, একজন সলিমুল্লাহ খানের মতো শিক্ষক, আকবর আলি খান বা সা'দত হুসাইনের মতো আমলা আমরা সনাতনী শিক্ষা পদ্ধতিতেই পেয়েছি। বাংলাদেশের অনেক সন্তান এখন পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। এমনকি প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির দায়িত্বও পালন করছেন ওই তথাকথিত সনাতনী পদ্ধতিতে বিদ্যা অর্জন করে। নাসাসহ বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানে গর্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, লেখাপড়ার এই পুরনো ধারায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শিক্ষার্থীকে লিখতে হতো যা শিক্ষার্থীর অজান্তেই তার মধ্যে একটি মূল্যবোধ তৈরি করে দিত। এখন টিক চিহ্ন (যদি লাইগা যায়) দেয়া লেখাপড়ায় তা হচ্ছে কি-না আমাদের জানা নেই। কারিকুলামে পরিবর্তন আনা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে গিয়ে কোচিং সেন্টার আর অমুক স্যার-তমুক স্যারের হাতে বিদ্যাদানের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া কোনো কাজের কথা নয়। আরও একটি ভয়াবহ বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি। একেবারে কেউই যে লেখাপড়া শিখছে না তা তো নয়। বিপদ হল, প্রকৃত লেখাপড়া শেখা দেশের ক্ষুদ্র অংশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সংখ্যক দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে হয় উচ্চশিক্ষার্থে, অথবা পেশা গ্রহণ করে। যাকে আমরা ব্রেন ড্রেন বলে থাকি।

অচিরেই শিক্ষার এই রুগ্ণ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ প্রয়োজন। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন, এখনই কোনো একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। হয় সনাতনী ব্যবস্থায় ফিরে যান, অথবা এমন শক্তভাবে স্কুল-কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করুন যাতে লেখাপড়া শুধু টিক চিহ্ন দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। শিক্ষকদেরও যেন অব্যাহতভাবে লেখাপড়া করতে হয়। সেইসঙ্গে শিক্ষকদের বিশেষ গ্রেডে নিয়ে আসা যায় কিনা ভাবা উচিত।

মহসীন হাবিব : *লেখক ও সাংবাদিক*